বাংলা সম্ভার

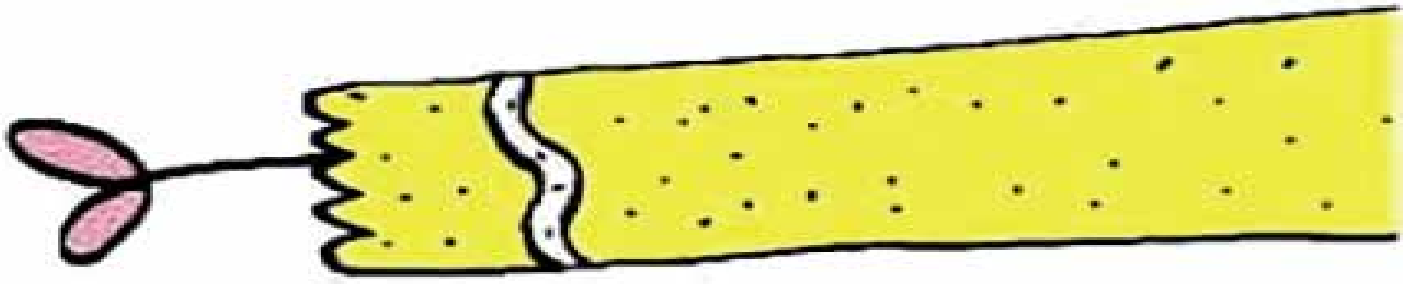

শিক্ষকবৃন্দের লেখা

(প্রবন্ধ-নিবন্ধ)

শিক্ষার্থীদের সৃজনকর্ম

(ছড়া-কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, জানা-অজানা ও কৌতুক)

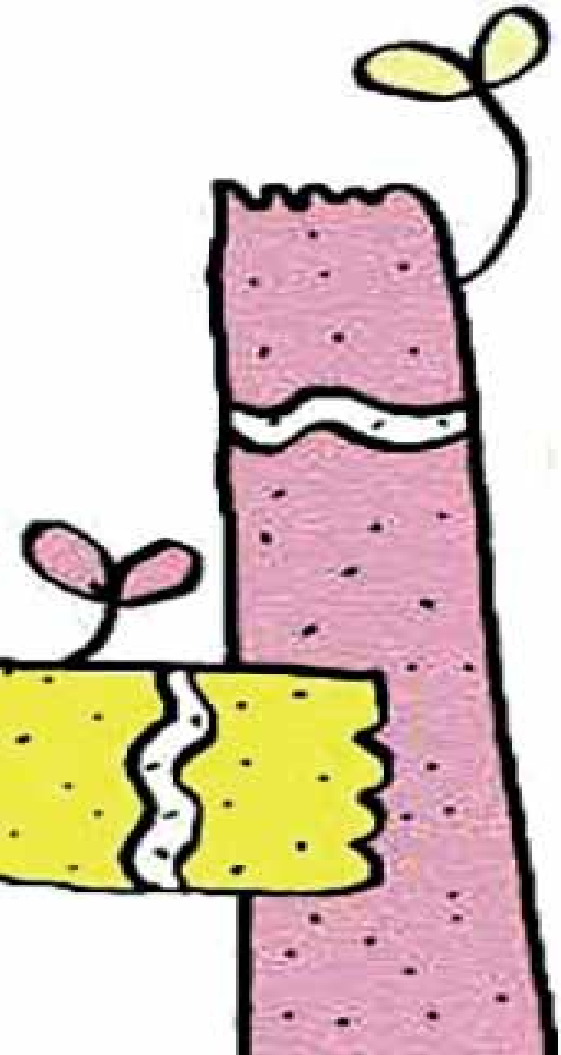

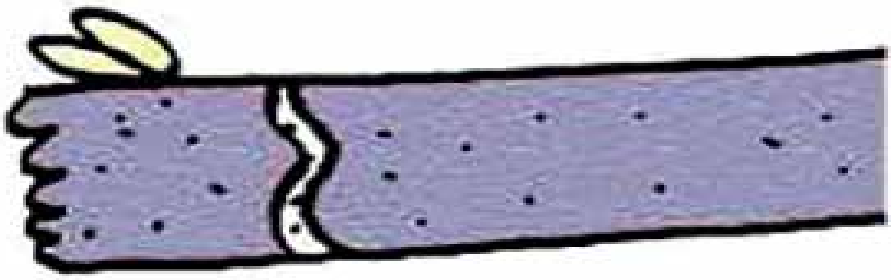

বাংলায় কথা বলি

মো. মিজানুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক (বাংলা)

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?

কবির এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই বলতে হয়– না, স্বদেশী ভাষা ছাড়া মনের আশা কখনই পূরণ হয় না। কেননা ভাষাই ভাব প্রকাশের প্রধানতম বাহন। মাতৃভাষায় যত স্বচ্ছন্দে ও সাবলীলভাবে মনের ভাব উপস্থাপন করা যায়, কোন পরভাষাতে নিশ্চয়ই সে ভাবে যায় না। সমস্যা এখানে নয়, আমরা বাংলাদেশের একেক অঞ্চলের বাংলাভাষী জনসাধারণ যেভাবে কথ্যরীতিতে আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ করি, সমস্যাটা সেখানে। বিশেষ করে সমাগমস্থলে, কথোপকথনে, বাগবিতণ্ডায়, সভায়, মিলমিশে, সেমিনারে ভাষার আঞ্চলিক কথ্যরীতির ব্যবহার শ্রোতার অর্থবোধকে কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে সবর্জনবোধ্য প্রমিত ভাষার ব্যবহারের বিকল্প নেই।

এ কথা কেন বলছি? বাংলাদেশে একেক জেলায় বা এলাকায় ভাষায় শব্দের ব্যবহারে ও বাগভঙ্গীমায় ভিন্নতা রয়েছে। এমনকি, একই জেলার এক অঞ্চলের ভাষার সাথে একটু দূরবর্তী অঞ্চলেও কখনো কখনো এই ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। কুমিল্লা, নোয়াখালি বা চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনসাধারণ যখন কথা বলে, তখন রংপুর বা দিনাজপুর তথা উত্তর অঞ্চলের মানুষের পক্ষে এর মর্মার্থ উদ্ধার করা শুধু কঠিনই নয়, অসাধ্যও বটে। আবার উত্তরাঞ্চলের অনেক শব্দই দক্ষিণ বা পূর্ববঙ্গে প্রায় অপরিচিত, অজ্ঞাত। সেগুলোর অর্থ উদ্ধার করতে বিশেষ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন পড়ে। এ কথা আমার বিশ্বাস কেউই অস্বীকার করবেন না। শুধু উত্তর-দক্ষিণ বা পূর্ব-পশ্চিম বাংলার কথা কেন, আমার জন্মস্থান রংপুর জেলার কথাই যদি বলি, এখানেও একেক অঞ্চলে ভাষা ব্যবহারে স্বরভঙ্গীর তারতম্য নানান বৈচিত্র্যের আস্বাদ (!) দান করে। আবার শব্দের পার্থক্য তো রয়েছেই। যেমন: 'ওদের' শব্দটি এই রংপুরেরই কোন অঞ্চলে 'ওমার', কোন অঞ্চলে 'ওস্মার' রূপে আঞ্চলিক কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হতে শুনেছি। স্বরভঙ্গীর বৈচিত্র্য তো বাদই দিলাম। কেননা, তা তো আর লিখে প্রকাশ করা যায় না, এটা শ্রুতিগ্রাহ্য ব্যাপার।

প্রাকৃতিক রূপ বৈচিত্র্যের দেশ আমাদের বাংলাদেশ। ঋতুতে ঋতুতে অপরূপ রঙে মোহনীয় আমাদের জন্মভূমি। এই অকৃপণ বৈচিত্র্য থেকে আমাদের বাংলা ভাষাও বঞ্চিত হয়নি। তাই একেক অঞ্চলে আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারে, বাগভঙ্গীমায় বাংলা ভাষা ঋদ্ধ। একদিক থেকে বিবেচনা করলে ভাষার এই আঞ্চলিক ব্যবহার দোষের কিছু নয়। ভাষা তো মাতৃস্তনের মতো। একেক অঞ্চলের মানুষ মাতৃকোল থেকে তার আঞ্চলিক ভাষা-রূপ আত্মস্থ করে করে বেড়ে উঠে। সে ভাষা তার দৈনন্দিন জীবনে যে রস সঞ্চার করে তা-ই তার পুষ্টি। সমস্ত দিনের কর্মকোলাহল শেষে সে আবার সেই ভাষাতে শান্তি খোঁজে নীড়ের আশ্রয়ে। তাছাড়া, যে দেশে অধিকাংশ লোক প্রকৃত শিক্ষার সাথে সম্পর্কই রাখে না, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের কাদা-মাটি-জলে যাঁদের জীবন-জীবিকা তাঁদের পক্ষে প্রমিত ভাষা ব্যবহারের প্রস্তাবনা আপাতদৃষ্টিতে একান্তই হাস্যকর। তাঁদের ক্ষেত্রে নাড়ির টানের ভাষাই উত্তম। অন্তর থেকে উত্থিত সে ভাষা মুখে মধু ছড়ায়।

তবে, ভাষার কথ্যরীতিতে আঞ্চলিক রূপের ব্যবহারের ক্ষেত্রে একান্তভাবে দুটি বিষয় মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে করি। এক. স্থান অর্থাৎ যে আঞ্চলিক কথ্যভাষায় ভাষার আদান-প্রদান হচ্ছে, তা ঐ আঞ্চলিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ আছে কি-না। দুই. পাত্র (জনগোষ্ঠী)। অর্থাৎ ঐ ভাষায় একই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হচ্ছে কি-না। যেমন: অনেক দিন পরে আপনি কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরলেন। আপনার মা-বাবা-আত্মীয়স্বজনদের সাথে আপনি যদি কেতাবি ভাষায় বা প্রমিত ভাষায় নিজের বিদ্যার জাহির করেন, তবে তা যতটা না আন্তরিকতায় পূর্ণ হবে, তার চেয়ে অকৃত্রিম আন্তরিকতার পরিচয় ফুটে উঠবে যে ভাষায় আপনি শৈশব-কৈশোরের দিনগুলোতে মায়ের কোলে শুয়ে নিবিড় আবেগে অবগাহন করেছেন। এখানে প্রমিত ভাষাই আপনার পরিবেশবোধকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে বৈকি।

অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কথা বাদই দিলাম,

আমরা যাঁরা নিজেদের লেখাপড়া জানা বলে দাবি করি, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেউই পরিপূর্ণ সচেতন বলে মনে হয় না। কেননা, কথা বলতে গেলেই আঞ্চলিক ঢং তো আছেই, অনেক চেষ্টা করেও আঞ্চলিক শব্দগুলো পরিহার করতে পারি না। এইতো সেদিন বিকেল বেলা আমার পরিচিত এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিসে করে (চড়ে) বাড়ি ফিরবেন?' ভদ্রলোক জবাব দিলেন 'বাজে করে'। ভদ্রলোক যে 'বাজ' শব্দটি বাক্যে ব্যবহার করেছেন অনেকক্ষণ পরে বুঝলাম, সেটা আসলে 'বাস'। এই উত্তর অঞ্চলেরই কোন কোন জায়গায় 'নজরুল' শব্দটিকে 'নরজুল' বলতে শুনেছি। অথচ তাঁরা যে লেখাপড়া জানে না, তা কিন্তু নয়। বুঝুন তাহলে! একবার এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকে নিয়ে ট্রেনে কোথাও যাচ্ছিলেন। পাশের আসনে আমিও বসা। হঠাৎ তাঁর পরিচিত এক ভদ্রলোক এসে মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন 'কনে যাচ্ছু বারে?' সম্ভবত, মেয়েটি শহরে মানুষ। গ্রাম্য ভাষার সঙ্গে তখন অবধি তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। বিষয়টি বুঝলাম অবাক বিস্ময়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে মেয়েটির ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা দেখে। শেষে বাবাই জবাব দিলেন। 'আসছে' চলমান কালের এই প্রমিত ক্রিয়াপদটি গাইবান্ধার কোনো অঞ্চলে গিয়ে আপনি শুনতে পাবেন 'আইস্যার নাকছে'। অন্য অঞ্চলে শব্দটির কি ব্যবহার আছে? নিশ্চয়ই নেই।

না, নয়, নি, নেই- এগুলো নেতিবাচক অব্যয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে কোন কোন এলাকায় কথায় কথায় ক্রিয়াপদের পরে ইতিবাচক বাক্যে 'নি'/'নে' এর ব্যবহার করতে শুনেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বার সময় আমার এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম 'ক্লাসে যাবি না?' সে উত্তর দিল 'একটু পড়ে যাবানে'। ভাগ্যিস বাংলা পড়েছিলাম। তার 'যাবানে' শব্দে 'নে'র ব্যবহার যে নিরর্থক এটা কয়জনে বুঝবে। আর একটা অদ্ভুত বাক্য তাকে মাঝে মাঝেই বলতে শুনতাম 'যাবা না নে'। এর অর্থ ইতিবাচক না-কি নেতিবাচক, না-কি বীজগণিতের সূত্রের মতো নেগেটিভ (−) নেগেটিভ (−) = পজেটিভ (− − = +), তা আজও আমাকে ভাবায়। 'বাউর' শব্দটির সাথে এইতো কিছু দিন আগে আমার পরিচয়। শব্দটি প্রথম যে দিন শুনেছিলাম, আমার নির্বুদ্ধ চেহারা বক্তাকে অবাক করেছিল। এরূপ হাজার হাজার শব্দের উদাহরণ দেওয়া যায়, যা শুধু বিশেষ অঞ্চল ব্যতীত অন্য অঞ্চলে কথ্যরীতিতে মোটেই প্রচলন নেই এবং সমানভাবে তা দুর্বোধ্যও বটে।

এই দুর্বোধ্যতার হাত থেকে ভাষার মুক্তির প্রয়োজন। নইলে মধুর বাংলা ভাষা সার্বজনীন মাধুর্য ছড়াবে না। কিন্তু কীভাবে সম্ভব? এ দায়িত্ব কার? নিশ্চয়ই নির্বিশেষে সকলের। বিশেষ করে আমরা যারা লেখাপড়া জানা এবং নিজেদেরকে ভদ্র বলে দাবি করি, তাদের। লেখাপড়া শিখে আমরা যাঁরা অঞ্চলের গণ্ডি পেরিয়ে নানান অঞ্চলের সাথে পরিচিত হয়েছি, তাঁরা যদি শুদ্ধতা রক্ষা করে ভাষার ব্যবহার না করি, অর্থাৎ প্রমিত বাংলা ব্যবহার না করি, তাহলে যাঁরা অঞ্চলের গণ্ডি পার হতে পারে নি, এলাকার ধুলো-হাওয়া-জল অঙ্গে নিবিড়, তাঁদের কাছে প্রমিত বাংলায় চমৎকার ভাবের প্রকাশ আশা করি কী করে? শিক্ষিত জনের মুখে শুনতে শুনতে তাঁরাও এক সময় প্রমিত ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে- যেমন করে মানব শিশু ভাষা শিখতে শিখতে বড় হয়ে ওঠে।

এ ক্ষেত্রে একটা কথা থেকে যায়। এভাবে ভাষা তার বৈচিত্র্য হারিয়ে কেতাদুরস্ত হয়ে পড়বে না-তো? হয়তো ভাষা পরিপাটি হবে, কিন্তু একদমই মাধুর্য হারাবে না। কেননা, আমরা তো আর প্যান্ট-শার্ট-টাই খিঁচে মায়ের কোলে বসব না। বড় কথা, পরিপাটিই তো সৌন্দর্য। সেটাই তো কাঙ্ক্ষিত। যেমন, সুন্দর পোশাকে ফিটফাট একজন যুবক সকলের আবেগের আকর্ষণ, পরিপাটি অর্থাৎ প্রমিত ভাষাও তেমনি। যেমন তার মাধুর্য, তেমনি তার সাবলীলতা, সর্বজনবোধ্যতা।

এতো গেল প্রমিত ভাষার একটা দিক। এর আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে– সেটা প্রমিত উচ্চারণ। ধ্বনিই ভাষার প্রাণ আর সে ধ্বনির উচ্চারণ যদি বিকৃত হয়, তাহলে শব্দটি শুধু শ্রুতিকটুই হবে না, অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অর্থকে অস্বীকার করে অনাকাঙ্ক্ষিত অর্থের প্রকাশ ঘটিয়ে শ্রোতার অর্থবোধের ক্ষেত্রে বিভ্রাটের সৃষ্টি করবে। আমাদের দেশে লেখাপড়া জানা না জানা নির্বিশেষে সকলেই আমার মনে হয় 'ড়' (তাড়নজাত) এর উচ্চারণ করতেই শিখিনি। এই তো সেদিন আমার এক সহকর্মী কোন এক প্রসঙ্গে 'হারে হারে টের পাওয়া' এর কথা বললেন। আমিও বুঝলাম তিনি তাঁর জ্ঞানপাঠ থেকে তাড়নজাতকে তাড়িয়ে দিয়েছেন শৈশবেই। নইলে, তা 'হাড়ে' না লেগে 'হারে' হবে কেন? বিষয়টা কীরূপ বিপত্তির বুঝুন একবার! অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণ বিপত্তিটা আমার মনে হয় উত্তরাঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে একটু বেশি। দ্রুত কথা বলতে গিয়ে অথবা সচেতনতার গাফিলতিতে এখানে কিছু মহাপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণটা দাঁড়ায় এসে অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে। ফলে, 'দেখতে দেখতে' বলতে গিয়ে কখন যে 'দেকতে দেকতে' হোঁচট খাই, 'বাঘে ধরেছে' বলতে গিয়ে 'বাগে ধরছে' বলি বুঝতেই পারি না। ঢাকা বা তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ আরো ভয়াবহ। নোয়াখালি, সিলেট ও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা সম্পর্কে আমার কিছু বলার নেই। সে সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে চলিতরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরী হাস্য-রসিকতার ছলে ব্যাঙ্গের তীক্ষ্ণ বাণ হেনেছেন।

ধ্বনি উচ্চারণের বিষয়ে এই যে কথাগুলো বললাম, তা শুধু লেখাপড়া না জানা জনসাধারণের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষিত লোকেরাই তো হরহামেশা ভাষাকে এমনিভাবে বিকৃত করছি। আসল কথা, ভাষা যদি ভাবের বাহন হয়, তাহলে এর শুদ্ধতা ও সর্বজনবোধ্যতা (শব্দ প্রয়োগে ও উচ্চারণে) একান্ত প্রয়োজন। কেননা, ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগই তো ভাবের শুদ্ধ প্রকাশ।

প্রশ্নের উত্তর খুঁজি

ড. মো. কামাল হোসেন
সহকারী অধ্যাপক (মনোবিজ্ঞান)

নবীনবরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অত্র প্রতিষ্ঠানে পরিবেশিত হয়েছিল একটি নাটিকা। 'একুশ শতকের বাহুবলি' নাটিকায় সে একজন মা, তুলি হাতে যখন ছবি বা আলপনা আঁকে, তখন সে চিত্রশিল্পী। আবার আবৃত্তি করার সময় দক্ষ বাচিক শিল্পী। দলীয় নৃত্য ও দলীয় সংগীতেও তাঁর নেতৃত্ব সবাইকে ছাপিয়ে যায়। তাঁর 'মা' অভিনয় ছিল অসাধারণ, চমৎকার ও দেখার মতো। অত্র প্রতিষ্ঠানে থাকাকালীন সে সবরকম সহপাঠ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতো। সাংস্কৃতিক সপ্তাহে কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উপস্থিত ও নির্ধারিত বক্তৃতা, নাটিকা, ধারাবাহিক গল্প বলা ইত্যাদিতে অংশ নিতো। এককথায় সে ছিলো সাংস্কৃতিক সপ্তাহের একজন সেরা পারফরমার। সিপিএসসিএস ক্যাম্পাসের সবার প্রিয় মুখ। তাঁর নাম নিশাত তাসনিম লাবণ্য। সবাই ডাকে লাবণ্য। বর্তমানে সে স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজে ১ম বর্ষে অধ্যয়নরত।

২০১৯ সালে আন্তঃহাউস বিতর্ক প্রতিযোগিতায় কয়েক ডজন শিক্ষার্থীকে পেছনে ফেলে ১ম স্থান অধিকার করে শাফায়েত আহমেদ স্বচ্ছ। এছাড়া তাৎক্ষণিক উপস্থিত বক্তৃতা ও ধারাবাহিক গল্প বলায় স্বচ্ছ সেরা। খেলাধুলায়ও সে ভালো। ২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে স্বচ্ছ গোল্ডেন এ+ নিয়ে কৃতিত্বের সাথে পাশ করেছে।

দুজন অদম্য মেধাবীর শিক্ষা জীবনের কিছু কথা সকল শিক্ষার্থীর জীবনে অনুপ্রেরণাদায়ক হয়ে উঠলে তাদের মধ্য থেকেও নিশ্চয়ই আরও সাফল্যের গল্প উঠে আসবে- সেই প্রত্যাশায় প্রবন্ধের মূল বক্তব্য শুরু করছি। আমাদের দেশে প্রচলিত ধরা-বাঁধা সিলেবাসের পড়াশুনা আর ভালো ফলাফলের ইঁদুর দৌড়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা বেড়ে উঠে, সেখানে সহমর্মিতা ও অন্যের মতকে গুরুত্ব দেয়ার মতো মানবিক বিষয়গুলো থাকে গুরুত্বহীন। তাছাড়া ফার্স্ট হতে হবে, ক্যারিয়ারে এগিয়ে থাকতে হবে–এত তাড়ার মধ্যে সৃষ্টিশীলতা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার সময় কই। তবে শিক্ষার্থীদের এমন শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা কার্যক্রমের নানান উদ্যোগ– সৃজনশীলতার বিকাশ ও মানবিক মূল্যবোধগুলো চর্চার চমৎকার একটি ক্ষেত্র।

সহশিক্ষা কার্যক্রম মানে পড়াশুনার বাইরেও বিভিন্ন গঠনমূলক ও সৃষ্টিশীল কাজে অংশ নেওয়া। সেটি হতে পারে খেলাধুলা, নাচ, গান, বিতর্ক, আবৃত্তি, অভিনয়, গল্পবলা, সায়েন্স ফেয়ার, গণিত অলিম্পিয়াড, বৃক্ষরোপণ অথবা স্বেচ্ছা সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে তাদেরকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে অত্র প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রম। শিক্ষার্থীরা নিজেদের আগ্রহের বিষয়টি বেছে নিয়ে অনেকে মিলে অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চর্চার বা অনুশীলনের সুযোগ নিতে পারে। প্রাণশক্তিতে ভরা শিক্ষার্থীদের তারুণ্যকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা কার্যক্রমের কোনো বিকল্প নেই।

সহশিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ক ক্লাবগুলো এমন একটি জায়গা, যেখানে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীরা একত্র হয়। সেখানে বয়সের পার্থক্য থাকে, আর থাকে মতামতের পার্থক্যও। তবু ক্লাবের স্বার্থে দিন শেষে একটি সুন্দর ফলাফল পেতে সব পার্থক্য ভুলে একসঙ্গে কাজ করে সবাই। আর এভাবেই তৈরি হয় ভিন্নমত বা ভিন্ন মানসিকতা মেনে নেওয়ার চর্চা।

একজন শিক্ষার্থী যদি তার শিক্ষাজীবনে (স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত) বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ক ক্লাবে যুক্ত থাকে তাহলে সে ভবিষ্যতে উদার চিন্তার মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে এবং শিখবে অন্যের মতকে শ্রদ্ধা করতে। এতে সে পরিবার ও কর্মস্থলে একটি দল হিসেবে কাজ করবে, সবার সাথে আস্থা ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরি করবে, অধস্তনকে অকারণে অপমান করবে না, ভুল হলে সঠিক পথ দেখিয়ে দেবে, প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ককে সে অবজ্ঞা করবে।

ক্লাসরুম আর বইয়ের পাতার বাইরের জগৎ যার কখনোই দেখা হয়নি, ক্লাবের মাধ্যমে সেও জেনে যায় বন্ধুত্ব কী চমৎকার একটি বিষয়। একক পরিবারে প্রায় একা একা বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থী ক্লাবের কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার অদম্য শক্তি। নতুন কিছু করার আত্মতৃপ্তি আর নতুন অর্জনের আত্মবিশ্বাস। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের বেশির ভাগই বড় হয় একক পরিবারে। ফলে প্রায়ই একাকিত্ব ও অস্তিত্ব সংকটে ভোগে। সহশিক্ষা কার্যক্রম বিষয়ক ক্লাবগুলোতে যেহেতু অনেকে মিলে একসঙ্গে কাজ করে, সেহেতু নিজেকে একা মনে করার সুযোগ থাকে না। ক্লাব তাকে একটি পরিচয় দেয়, একটা প্ল্যাটফর্ম দেয়, যেখানে দাঁড়িয়ে সে নিজের কথা বলতে পারে। নিজের কথা বলতে

পারার এ সুযোগ শিক্ষার্থীদের জন্য ভীষণ জরুরি।

বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে সহিংস উগ্রবাদ বৃদ্ধির কারণগুলোর মধ্যে উদ্দেশ্যহীনতা, অস্তিত্বের সংকট, নিজের মতামত প্রকাশের জায়গা না থাকা অন্যতম। অর্থাৎ তরুণেরা যখন নিজেকে একা মনে করে, তার মতামত যখন যথার্থ গুরুত্ব পায় না, তখনই সে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে; যা পরবর্তী সময়ে তাকে ভুল পথের দিকে ঠেলে দেয়। যে শিক্ষার্থী বিতর্ক করে সে জানে কীভাবে মুক্তচিন্তা করতে হয়, কীভাবে অন্যের মতামতকে মূল্যায়ন করতে হয়। যে সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করতে জানে, ধ্বংসের ভয়াবহতা তাকে আকৃষ্ট করে না। দলগত কাজের শক্তি যে বুঝতে শেখে বিচ্ছিন্নতাবাদ তাকে বিভ্রান্ত করে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা কার্যক্রমের চর্চা তরুণদের দেয় সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্র, দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার শিক্ষা।

তবে সবার আগে ঠিক রাখতে হবে পড়ালেখা, এর কোনো বিকল্প নেই। সহশিক্ষা কার্যক্রমগুলোতে বেশি জোর দিতে গিয়ে আবার রেজাল্ট খারাপ করলে চলবে না। জিপিএ একটা মানদণ্ড। দুটোই ঠিক রাখতে হবে। সহপাঠ কার্যক্রমকে শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করবে আনন্দ ছড়িয়ে দিতে। এতে আছে বিশ্বকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা। আছে অনুপ্রেরণা দেওয়ার শক্তি। মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার এমন ক্ষমতা এতে আছে, যা অন্যকিছুতে নেই। সুতরাং সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থীকে এগিয়ে রাখবে। এতে দলগত কাজের মানসিকতা তৈরি হবে। চাকুরিদাতারা চাকুরিপ্রার্থীদের মধ্যে খোঁজেন-যোগাযোগের দক্ষতা, নেতৃত্বের গুণাবলি, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও দলগতভাবে কাজ করার দক্ষতা। মাথা ঠাণ্ডা রেখে সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে কিনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন "গ্রুপ ওয়ার্ক" করতে হয়। সেখানে তারা দলগতভাবে কাজের চর্চা করতে পারে। অধিকাংশ সময় দেখা যায় একজনই সব কাজ করে। বাকিরা তেমন কোন ভূমিকা রাখে না। যারা কাজ করল না, তারা যেমন নিজের ক্ষতি করল; তেমনি যে একা সব কাজ করে ফেলল, সে-ও বোকামি করল। অন্যের সঙ্গে কাজ করা শিখতে হবে। আবার একটা কাজ ভাগাভাগি করে করাও শিখতে হবে।

আমার ছেলেকে বলতাম, "ক্লাসে প্রথম হওয়ার জন্য যদি তোমাকে সারাদিন লেখাপড়া করতে হয়, তাহলে সেটা আমার দরকার নেই, প্রথম সারিতে থাকলেই চলবে"। লেখাপড়া, খেলাধুলার পাশাপাশি বাচ্চাদের সব রকম কাজ শেখানো উচিত। একদিন বিতর্ক প্রতিযোগিতার সেরা বক্তাকে প্রশ্ন করলাম। সে বলল, "আব্বা বলতেন, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চর্চা কর, নিজের ভুল ত্রুটিগুলো ধরতে পারবা। সেভাবেই চেষ্টা করতে করতে একদিন সেরা বক্তা হয়ে গেলাম।" মা-বাবার চাওয়া উচিত সন্তানের লেখাপড়াটা যেন আনন্দের হয়। জোর করে কুইনিনের মতো গিলিয়ে দেওয়া কিছু নয়। মা-বাবার সঠিক নির্দেশনা ও দোয়া থাকলে সন্তান নিজের চেষ্টায় সঠিক জায়গায় যেতে পারবে। ক্লাসে প্রথম না হলে জীবনে বড় কোনো ক্ষতি হয় না। বরং লাভ হয় বেশি। ওই অবসরে সে হয়তো জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্য কিছু শিখে নিতে পারে।

একজন শিক্ষার্থীর কর্মস্পৃহা ও আত্মবিশ্বাস- এ দুটি দক্ষতা থাকা সবচেয়ে জরুরি। এ ক্ষেত্রে একটা উদাহরণ দিই। একটি ছেলে গ্রামের একটি স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পেরিয়ে ভর্তি হয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু এমবিএ পড়ছে ঢাকার মোটামুটি মানের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাকে প্রশ্ন করলাম, 'তুমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করলে না কেন?' সে বলল, 'পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তার একটা চাকরির প্রয়োজন ছিল।' চাকরির খোঁজেই সে ঢাকায় চলে এসেছে। সব শুনে মনে হল, ওর মধ্যে কর্মস্পৃহা ও আত্মবিশ্বাস রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের জন্য আমার তিনটি পরামর্শ: প্রথমত, নিজের লক্ষ্যটা জান। সবার আগে জানতে হবে–তুমি কী করতে চাও, কী হতে চাও। লক্ষ্য সম্পর্কে ভালো মতো জান। কোথায়, কী কী কাজের সুযোগ আছে, কী কী দক্ষতা দরকার এবং লক্ষ্য অনুযায়ী প্রস্তুতি শুরু করা। দ্বিতীয়ত, পরিবার থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। কারণ পরিবার একটা বিরাট শক্তি। তাই পরিবারকে ছেড়ো না। পরিবারকে ছাড়লে খারাপ কিছুতে মানুষ সংযুক্ত হয়ে যায়। অনেক সময় নেশায় আসক্ত হয়, মাদকে আসক্ত হয়। মা-বাবাকে মিথ্যা বলে কিন্তু বেশি দূর যাওয়া যায় না। কাজেই পরিবার একটা শক্তি–সেই শক্তিকে ব্যবহার করে তুমি ক্যারিয়ারে এগিয়ে যাও, ভালো ও আলোকিত মানুষ হয়ে গড়ে ওঠ। তৃতীয়ত, তোমরা কখনো তোমাদের স্বপ্নটা বদলাবে না। বরং নিজেকে বদলাবে। শুধু নিজের কথা ভাববে না। বাবা-মা, পরিবার, দেশ সবার কথা ভাববে। পুরো বিশ্বকে নিয়ে ভাব। ইন্টারনেট পুরো বিশ্বটাকে সংযুক্ত করেছে। সুযোগটা কাজে লাগাবে। অনেকের স্বপ্ন আছে, কিন্তু পরিশ্রম করে না। আবার অনেকে পরিশ্রম করে, কিন্তু স্বপ্ন নেই। সফল হতে হলে দুই-ই থাকতে হবে। স্বপ্ন দেখতে হবে, পরিশ্রমও করতে হবে। নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে শিখলেই তোমার মধ্যে জয়ী হওয়ার ক্ষুধা তৈরি হবে।

লাবণ্য ও স্বচ্ছর গল্পটা একটু আলাদা। বাস্তববাদী এ দুজন শিক্ষার্থী সহশিক্ষা কার্যক্রম ও পড়া একসঙ্গে চালিয়ে গেলেও একাডেমিক শিক্ষাকে তারা একধাপ এগিয়ে রাখত। তাঁদের দেখানো পথ ধরেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভাবনা মাথায় রেখে পরিশ্রম করে যাও শিক্ষার্থীরা। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা সবাই হয়তো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর ইত্যাদি হবে। কিন্তু তোমরা কতটা ভালো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে সেটাই প্রশ্ন। ভালো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কোথা থেকে আসবে? পাঠ্যবই থেকে নয়। ভালো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে ভালো মানুষ হতে হবে। তোমরা সারাদিন Virtual Network এ ব্যস্ত থেকে সময় নষ্ট করছো। এটা তোমাদের জন্য কোন সুফল বয়ে আনে না। জীবনের আনন্দ আমরা খুঁজে পাই সময়ের কাছ থেকে। কেউ যদি তোমাদের কাছ থেকে এই সময়কেই কেড়ে নেয়, তাহলে কীভাবে তোমরা সুখী হবে? তোমরা যদি সময়কে অন্য কাউকে দিয়ে দিতে থাক; তাহলে তোমাদের জীবন কোথায়? কীভাবে তোমরা তোমাদের ভেতরের মানুষকে গড়ে তুলবে? চল আমরা সকলে এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজি।

আত্মার আত্মীয়

মো. বিপ্লব আলী
সিনিয়র প্রভাষক (বাংলা)

প্রায় ৫০০ শত কোটি বছরের পৃথিবীতে তিল তিল করে গড়ে তোলা সভ্যতার এ স্বর্ণযুগে হঠাৎ স্তম্ভিত হওয়ার দৃশ্য যেন মানুষের চির অচেনা। অহর্নিশ আদিগন্ত বিস্তৃত কায়াগুলো কেবল আত্মার বিচরণে তুষ্ট হতে পারে না। কেননা মায়া বলে কথা! আজন্ম পদভারে মুখরিত জল-স্থলের মায়া বলে কথা! চেনা-অচেনা পরিবেশের মায়া বলে কথা! এ এক আশ্চর্য মায়াভরা পৃথিবী - যেখানে কায়ার মায়াই প্রধান।

আত্মাকে মায়া করা যেন অতিমানবীয় এক অকল্পনীয় ব্যাপার। আত্মার আত্মীয় যেন দুঃস্বপ্নের বিভীষিকাময় এক অধ্যায় হিসেবে ভাবলোকের ব্যাপার। পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে যে বন্ধন আজ অবধি পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রেখেছে বলে আমার বিশ্বাস- আজ তা ভূলুণ্ঠিত প্রায়। আচার সর্বস্ব মানুষগুলো কেবল বাইরের ঠাঁট নিয়ে ব্যস্ত। তাইতো আকারের প্রতি আকর্ষণ যেন আজন্ম লালিত স্বপ্ন। আত্মার আরাধনা মানে দ্ব্যর্থহীন পাগলের ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই না। কেননা সমাজ যেখানে কায়া সর্বস্ব সেখানে তার ভেতরের সত্তার আরাধনা কেন?

অধুনা সমাজ-সংসার বাহ্যত আমার আমিকে চর্মচক্ষু দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে- অন্তর্চক্ষু তো অন্তরালে থাকে লুকিয়ে। ভাবে-ভাষায়, দানে-মানে তোমার বহিঃপ্রকাশ তথা লোকপ্রকাশ মহিমান্বিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। নিটোল-নিখাদ ভালোবাসা এখন মূল্যহীন। এর জায়গায় যোগাসনে বসে আছে চর্মচক্ষুর ভালোবাসা। লোভাতুর আত্মা লোভ সংবরণ করে দুর্লভ হওয়ার গৌরবে সৌরভ ছড়াবে সে প্রতীক্ষার প্রহর গণনা করে কাল ক্ষেপণ করবে- তা প্রায় লুপ্ত। দশদিগন্তে অযুত-নিযুত অক্ষিবলয় যে প্রাপ্তির নেশায় ছুটছে- সে প্রাপ্তির প্রত্যাশা বিমুখ হওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। স্রোতের অনুকূলে চলাই তো মানব সমাজের সহজতর পদক্ষেপ- স্রোতের প্রতিকূলে যে বেগ, যে শক্তি, যে সাহস, যে ধৈর্য, যে ক্ষিপ্রতা, যে গতি, যে মতি আবশ্যক- তা বিপন্ন-উজাড়। নষ্ট ক্ষেত যেখানে স্পষ্ট, সেখানে কষ্ট করে কেন হৃষ্ট ক্ষেতে বিচরণ? সবারই যদি চলে তবে আমার চলে না কেন? বোলের তালে পাল তুলে তরী বেয়ে ত্বরিত গতির ধাবমান রূপ আমাদেরকে পরিগ্রহ করে আছে আষ্টেপৃষ্ঠে। কায়মনোবাক্যে একই ধর্মের বর্ম পরিধান করে সমাজের উঁচু মঞ্চে আসীন হওয়ার ব্রতে আমরা ব্রততী। এ যেন রঙ্গমঞ্চের মহাযজ্ঞে শত অভিনেতা-অভিনেত্রীর লীলা রঙ্গালয়। অহর্নিশ যে লীলাখেলায় আমরা মত্ত তাতো জীবনের প্রয়োজনে অপরিহার্য। কিন্তু যা সতত সকলের দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ-পাগল করা অভিনয় তাতো নিষ্প্রয়োজন-অবান্তর। মহাকালের যাত্রাতরীতে এরা অপাঙ্‌ক্তেয়। ক্ষণিক আলোয় আলোকিত হয়ে ক্ষণিকালয়ে ক্ষণকালের স্থিতিতে যারা বিশ্বাসী- তারা এ ধর্মের বর্ম পড়ে হয়ত তুষ্ট কিন্তু তা নিরানন্দময়। মোহ মানুষের মনকে মোহাবিষ্ট করবে- কারণ এটাই তার ধর্ম। কিন্তু এটাকে অতিক্রম করা মানুষের কর্মের ধর্ম। আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হওয়ার স্বেচ্ছা বাসনা নিয়ে কেউ ধরাধামে অবতীর্ণ হয় না। সময় বা কালকে যেভাবে ধারণ করবে সেভাবে স্বীয়কাল অতিক্রান্ত হবে। রঙিন চশমা পড়ে দৃশ্যমান সবকিছু রঙিন মনে হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। রঙিন চশমা যেমন তার ভোল পাল্টাতে পারে না ঠিক তেমনি ব্যক্তির ভোল পাল্টাতে তার আচার সর্বস্ব রূপ পরিত্যাগ বাঞ্ছনীয়।

টিকে থাকাই এখন চরম সার্থকতা, অন্যায়-অসততা, অপরাধ-অসাধুতা, অসৌজন্য-অপ্রীতিকর উপায়ে অহেতুক গগনবিচুম্বী প্রাসাদ বিনির্মাণে সমাজ ব্যস্ত। জীবনের স্বাদ এখন বিত্ত-বৈভবে। আমার অর্জন যতই কদর্যপূর্ণ হোক, যতই নিকৃষ্ট হোক তা বিবেচ্য নয় বরং সমাজে অর্জিত অর্থের প্রচার-প্রসার কতটুকু তা-ই বিবেচ্য। বিত্তহীন অবস্থার পরাকাষ্ঠা বিত্তশালী রূপে পরিগণিত করার প্রধান সোপান। দু'চোখের বিশ্বাস- আস্থা হাজার চোখের ভিড়ে ম্লান-বিবর্ণ। দু'হাতে সমস্ত জঞ্জাল উন্মুলন করা অসম্ভব, কিন্তু হাজার হাতে উন্মুলন করা রীতিশুদ্ধ। একজনে ঐক্য হয় না, কিন্তু ঐক্যের জন্য প্রতিজনের ভূমিকা অপরিহার্য। সমাজের নাভিমূলে যে বিষবাষ্প শিকড় গেড়ে বসেছে তার মূলোৎপাটন অনস্বীকার্য। প্রতিজন যদি দূরে সরে না গিয়ে প্রতিজনের অপরিহার্য অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তবেই সমাজ হবে পঙ্কিলমুক্ত- অসুর বর্জিত সুরপুর। গগন বিদারী হাহাকার কর্ণকুহরে প্রবেশ করাটাই এখন মুখ্য। চলৎসার সমাজ ব্যবস্থায় কে নিবে সে গুরুভার?

বিত্ত-বৈভব অর্জনের প্রক্রিয়াটা যা-ই হোক সমাজ কিন্তু স্বল্প ব্যবধানে তা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে ফেলে। প্রকৃতির আশীবিষের ছোবল মুক্ত হওয়া সেতো সুদূর পরাহত। সমাজে আজ যে নবাব - কাল সে ফকির; আবার ফকিরও নবাব। জীবন ঘনিষ্ঠ নির্জন কল্পনা জীবনকে জানার এবং উপলব্ধি করবার জন্য যথেষ্ট। সোনালি স্বপ্নে বিভোর যন্ত্র-জীবনে সে সময় পাব কোথায়? রাজ্যসুখ অর্জনে শরীর পাতন করে আসমুদ্রহিমাচল পরিগ্রহ করা জীবনে পূর্ণ এ সংসার। যেখানে বৈভব অর্জনে নেই কোন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য- নেই কোন সীমা-পরিসীমা। এক সীমাহীন

অসীমের পেছনে নাভিশ্বাস ছুটে চলার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতেছে বিশ্ব সংসার। সীমাকে স্পর্শ করা যায় কিন্তু অসীম-সেতো অস্পৃশ্য-অলীক-মায়া-ধরাছোঁয়ার বাইরে।

জীবন দিয়ে যদি জীবনকে উপলব্ধি করার প্রয়াসে জীবনকে আবেশিত করা যেত তাহলে মানব জীবনে এর রূপ হতো মাধুর্যমণ্ডিত। বাহ্যিক আলোয় আবেশিত হওয়ার প্রক্রিয়াটা সহজ, কেননা তা অন্তর্নিহিত চেতনাজাত তৃপ্ততার সাথে সম্পর্কহীন। হীনপ্রাণ জীবসত্তা বাহ্যিক চেতনাজাত আলোয় আলোকিত হয়ে তুষ্ট হতে পারে, কিন্তু চিরঞ্জীব জীবসত্তা বাহ্যিক আলোয় ম্রিয়মাণ। আপনাকে আপনি চিনলেই যদি যথেষ্ট হতো, তবেই আপন আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার মধ্যে সকল সুখ-সকল তৃপ্তি নিহিত হতো। দশজন পরিবেষ্টিত লোভাতুর আত্মা উদারতার মহান শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ। চর্মচক্ষুর দেখে শেখার প্রবণতাই মানবকূলকে উদারতার ঝাণ্ডা উড়াতে হিমালয়সম প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। কায়ক্লেশে চলিষ্ণু দীপ্তিহীন, অনির্মলা-নিস্তরঙ্গ পতন-উন্মুখ জীবসত্তা সমাজে যেভাবে কাষ্ঠগহ্বরে চঞ্চু বহিঃপ্রদর্শন করে তা লোভাতুর আত্মাসমূহের ক্ষুধা মেটাতে পারে না। ঝলকানো আলোর রঙ্গালয়ে মাটির প্রদীপ অমাবস্যার অমানিশা কাটাতে অপারগ। দিগন্ত প্রসারি দৃষ্টি উঁচুমার্গে ভ্রমণে উৎসুখ-উন্মুখ, আপনাকে কোনরূপে সেথায় পৌঁছাতে পারলে পরম প্রাপ্তির আত্মতুষ্টিতে পরিতৃপ্ত। কিন্তু উঁচুমার্গে আসীন হলে সার্বজনীন রূপ নিমিষেই ভূলুণ্ঠিত হয়ে অচ্ছুতজীবে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। সার্বজনীন হয়ে বেঁচে থাকার প্রত্যাশা মানুষ মাত্রই লালন করে। অধিকন্তু উঁচুমার্গে পদার্পণে দ্বিধাহীন প্রাণপণ লড়াই সে করবেই করবে। আপনাকে আপনি নির্বাসনে পাঠানোর এ লড়াই মানুষকে করেছে এক অবিমিশ্র লড়াকু। আদতে শান্তি হচ্ছে নির্বাসিত, আর এক নিয়ন্ত্রণহীন অজানা সুখের মোহ হচ্ছে আমন্ত্রিত।

লৌকিক মাধুর্য, লৌকিক ধর্ম দিন দিন ঊর্ধ্বগগনে দেদীপ্যমান। লোকাচার পরিবৃত হয়ে লজ্জার সজ্জা ছিন্ন করে বস্তুগত সুখ অন্বেষণে তথা অর্জনে মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে জীবনভর তদীয় উদ্দেশ্য সাধনে সমাজ নিমগ্ন। যা প্রতিকূলতায় পরিকীর্ণ হওয়ার কথা - তা এখন আনুকূল্যের স্বর্গরাজ্য। কণ্টকাকীর্ণ-অমসৃণ পথ পুষ্পার্ঘ্য বিস্তৃত মসৃণ। দুরাচার যখন সুআচারকে আচ্ছাদন করে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মত পথ যখন দুরাচারকে আলিঙ্গন করে তখন সুআচার নিস্তেজ হয়ে নিভৃতে গমন করে। সুরাসুর সংশ্লিষ্ট কর্মক্ষেত্রে অসুরের অমিততেজ সুরকে নির্জীব তথা কোণঠাসা করে রাখার প্রবণতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। বিদীর্ণ চিত্তে বুকফাঁটা ক্রন্দন অন্তরে চেপে রেখে অসুরের দীপ্তি চাক্ষুষ করে সুরের আবেশ ছড়ানোর প্রত্যাশায় নিয়ত বুক বাঁধে। মনে ভাবে সুদিন সন্নিকটে।

নিরবচ্ছিন্নভাবে অসুর দলনে পিষ্ট হয়ে প্রকৃতি দলিত-মথিত হবে, নীল জলের অতলান্তে নিমজ্জিত থাকবে তা অপ্রত্যাশিত-অকল্পনীয়। যা সর্বংসহা তার সহ্যবোধ উপলব্ধ কিন্তু তার প্রতিরোধ-প্রতিবাদ-প্রত্যুত্তরের রূপ অচেনা-অবোধ্য। চেনা রূপের চাল সামলানোই যেখানে কষ্টকর সেখানে অচেনা রূপের অসম্ভব রাহুগ্রাসের করাল থাবা থেকে মুক্তির উপায় কী? প্রকৃতির মন্দা মানা যায় কিন্তু মানবসৃষ্ট মন্দভাগ্য মেনে নেয়া যায় না।

আত্মকে অতিক্রম করবার নেশায় যেন সমাজ অস্থির। মণি-মুক্তা-হেম এসবের প্রেম মানুষকে নেশাসক্ত করেছে। শেমলেস ফেম অর্জনের এক কৌতুককর ভাবনা মানুষকে বিচলিত করছে অহর্নিশ। বিশাল পৃথিবীতে নিজেকে ব্যাপৃত করবার বাসনাই এখন মুখ্য। মনে বড় আহ্লাদ-প্রহ্লাদ স্বপ্নসম স্বর্গরাজ্যের সোপানসমূহ অতিক্রম করে স্বীয় রাজ্যে সরবে বসতি স্থাপন করবার। তদীয় রাজ্যে যখন পদার্পণ করে তখন নব স্বপ্নে বিভোর হয়ে নব উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে হররোজ নব রাজ্যের সোপানসমূহ অতিক্রমে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। আদি-অন্তহীন বাসনা কুরে কুরে খাচ্ছে মানুষকে। জীবনের অর্থ এখন অর্জনে ও ভোগে। পরার্থে-ত্যাগে নিজেকে সোপর্দ করবার মহান দীক্ষা-শিক্ষা এখন উপেক্ষিত। যা বাঞ্ছিত তা উপেক্ষিত; যা অবাঞ্ছিত তা লালিত।

আকাশসম উচ্চাশা স্বর্ণচূড়া স্পর্শে গৌরব অহমিকায় প্রতিভাত হবে বটে কিন্তু লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শূন্যবৃত্তে পরিণত হবে। চূড়ার বলয়ে থেকে লোকবৃত্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তা তুচ্ছ, ছোট, হীন-মলি গোচরীভূত হয়। যার সংস্পর্শে তনু-মন ধন্য ছিল আজ তা অপাঙ্‌ক্তেয়, তাই পরিত্যাজ্য। কালের কপল তলে একি বৈপরীত্য? সাধারণ্যে তার প্রয়োজন থাকুক না থাকুক পারিপার্শ্বিক জীবনবোধ থেকে তার হারিয়ে যাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। তবে চূড়ায় বসে কিয়দক্ষণ সুখ লাভ হয় বটে কিন্তু চিরস্থায়ী সুখ সেখানে অসম্ভব।

মোহাচ্ছন্ন তন্দ্রাকাতর স্বপ্নবিভোর লক্ষ্য সাধনের অলীক জগৎ থেকে সুপ্তোত্থিত হয়ে জীবনের প্রকৃত মানে খোঁজা জরুরি। সীমাহীন অর্জনের লাভার লেলিহান শিখা নির্বাপণ করে মৃত আগ্নেয়গিরির রূপ চিত্তে ধারণ অপরিহার্য। সমাজ বিচ্ছিন্ন চূড়ার অধিকার ছিন্ন করে সাধারণ্যে আপন সত্তার বিস্তার ঘটানোর এখনই সময়। আপনার হীন আলোক সত্তার বিলোপ সাধন করে মানবিক বিকাশে নিজেকে সমর্পণ করার প্রেরণায় উজ্জীবিত হওয়ার বড় বেশি দরকার। তুচ্ছ-সাধারণ ভাবনার ইতি টেনে দুরন্ত দুর্বার গতির পেখম মেলে ভাসতে হবে ভাবলেশহীন মুক্ত জীবনে। লোভাতুর আত্মার বিনাশকল্পে কায়ার মায়াকে ত্যাগ করে আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করার সাধনায় সিদ্ধি লাভের ব্রতরশ্মি বিকীর্ণ করতে হবে সমাজের নাভিমূলে। জ্ঞানে-গুণে অত্যুজ্জ্বল শিক্ষার প্রেরণা মর্মে ধারণ করে নিজেকে সম্পৃক্ত করার ধর্মই হবে প্রকৃত শিক্ষা। আত্মাকে আত্মা দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। বাহ্যত মানবিক, লোক দেখানো আত্মীয়ভাবাপন্ন রূপ, হীনপ্রাণ বন্ধুত্বের বন্ধন লৌকিক স্বজন প্রভৃতি স্থলে আত্মার আত্মীয় হওয়ার মহান ভাবনা মনসিজ মাঝে লালন করে যুগ যুগ ধরে সমাজে ছড়িয়ে দেয়াই কাম্য।

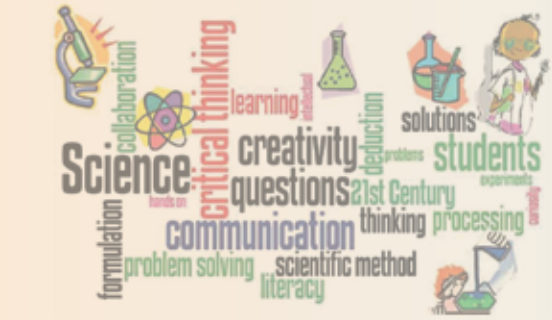

ড. মো. আশরাফুল কবীর
সিনিয়র প্রভাষক (প্রাণিবিদ্যা)

শিক্ষাক্ষেত্রে বিজ্ঞান চর্চা: একাল-সেকাল

অতীতে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও মূলত সেগুলি ছিল অনানুষ্ঠানিক। তখনও সেখানে পাঠদান হতো তবে সেটি ছিল শুধুই জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু। তখনকার জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের অর্জিত জ্ঞান সবার মাঝে বিতরণ করতেন। সক্রেটিসের (৪৭০-৩৯৯ খৃষ্টপূর্ব) পূর্ব এবং তার পরবর্তী সকল মনীষীদের জীবনীতে তাদের সেসকল জ্ঞান-সাধনা, চর্চা ও বিতরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তবে সেসময় এখনকার মত এত উল্লেখযোগ্য বিদ্যাপীঠের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় না। প্রাচীনকালের মিশরের মমি থেকে শুরু করে কৃষিকাজ, প্রাণী প্রজনন সকল কিছুতেই তারা বিজ্ঞানের যথার্থ ব্যবহার করেছিল। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটিস (৪৬০-৩৭০ খৃষ্টপূর্ব) মানব শারীরতত্ত্বের উপর যে সকল বক্তব্য রেখেছিলেন তা এখনও মেডিকেল কলেজগুলোতে পড়ানো হয়। অর্থাৎ বিজ্ঞান চর্চা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের কাছে নতুন কোন বিষয় নয়। বর্তমানে প্রযুক্তি আসাতে সে সকল ধ্যান-ধারণার বিকাশ ঘটেছে যা এখন নির্ভুলভাবে মানব কল্যাণে ব্যবহার হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা এখন অনেক তথ্য পাওয়াতে সেগুলির সঙ্গে তাদের চিন্তা-চেতনার সংযুক্তি ঘটিয়ে তৈরি করছে নানাবিধ আবিষ্কার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ ও বিজ্ঞান মেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এগুলো প্রতিনিয়তই তৈরি করছে। শিক্ষার্থীরা তাদের মেধাকে এখন সর্বোচ্চ ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। ছোটবেলা থেকেই তারা বিজ্ঞান চর্চার ফলে অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। এ সকল বিজ্ঞান চর্চা তাদের জীবনকে বদলে দিচ্ছে; তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। এই বিশ্বে অনেক ব্যক্তি ছিলেন তারা অনেক ক্ষেত্রেই মেধা বিকাশের তেমন সুযোগ পায়নি। তবে বর্তমানে প্রতিভা থাকলে তা বিকাশের সম্ভাবনা বলা যায় শতভাগ। এক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি কার্যকরী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এর মাধ্যমে তারা মূলত অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকার সান্নিধ্যে থেকে তাদের কাছ থেকে সকল অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে নিজেকে আরো ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। তথ্য-প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়নের ফলে শিক্ষার্থীর একটি বিশেষ শ্রেণি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শিক্ষকেরা তাদের প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানে যে সকল তথ্য সরবরাহ করেন তার সবই আজ বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত। নতুন নতুন আবিষ্কার আমাদেরকে নতুনভাবে বাঁচার অনুপ্রেরণা দিচ্ছে। আমরা আমাদের আয়ু বাড়াতে পেরেছি, অনেক জটিল রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছি, সঠিক পুষ্টিমানের খাবার পাচ্ছি এমনকি যে সকল ভ্রান্ত ধারণা আমরা এতদিন থেকে লালন করছি সেগুলো যত দিন যাচ্ছে বিজ্ঞানের প্রমাণের ফলে সেগুলো দূরীভূত হচ্ছে। প্রাগৈতিহাসিক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবিকশিত বিজ্ঞান চর্চাই বর্তমানে উন্নত ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর ও নির্ভুল বিজ্ঞানের পথ ধরে চলছে এবং ভবিষ্যতের পথকে আরো বেগবান করে দিচ্ছে আমাদের শিক্ষার্থীদের মাঝে। শ্রবণ ও দৃশ্যমান অবয়ব বিজ্ঞানের পথকে প্রসারিত করছে বর্তমানের শিক্ষার্থীদের মাঝে। শৈশবকাল থেকেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বিজ্ঞান চর্চা ও এর সঠিক ব্যবহার তাদের মা-বাবাকেই দেখিয়ে দিতে হয়। কারণ একজন শিশুর নিজ গৃহই হলো তার জীবনের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান চর্চার সেকাল ও একালের তুলনামূলক আলোচনাতে আমরা দেখতে পাই-

চিকিৎসা ও পুষ্টি শাখা: সুস্বাস্থ্য ও সঠিক খাদ্যাভাস একটি অতি প্রাচীন প্রথা। তবে এখন তা অনেক বিকশিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। হিপোক্রেটিস যিনি ছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক তিনিও সেই সময় অস্বাস্থ্যকর খাবার এড়িয়ে চলতেন। পূর্বে মানুষ শুধু বাঁচার জন্য খেত এবং অধিকাংশ মানুষই সুষম খাদ্য ও আদর্শ খাদ্য সম্পর্কে তেমনটা জানতেন না। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই বর্তমানে মেডিকেল সেন্টার রয়েছে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের স্বাস্থ্য ও খাদ্যাভাস সম্পর্কে সঠিকভাবে বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ পায়। স্বাস্থ্যই সকল প্রশান্তির আধার এবং একজন শিক্ষার্থী সুস্বাস্থ্য নিয়ে তবেই পরবর্তী ধাপে উন্নীত হতে পারে। বিজ্ঞানের সঠিক প্রয়োগ ব্যতীত কোন কিছুই সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

ব্যায়ামাগার ও শরীরচর্চা বিভাগ: অতীতে ব্যায়াম বলতে শুধু খেলাধুলাকেই বোঝানো হত। তবে বর্তমানে এই শাখাতে ব্যাপক গবেষণা বা চর্চার ফলে ব্যায়ামকে শরীরচর্চা থেকে পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। শরীরচর্চাতে শুধু দেহের সঞ্চালন বা রক্তের গতি বৃদ্ধি পায় তবে সঠিক ব্যায়ামের মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরীণ সকল অঙ্গের সঠিক বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। সেকাল-একালের বিষয়টি যদি পর্যালোচনা করা যায় তবে বলা যায় একালে ব্যায়ামের যুগান্তকারী প্রসার ঘটেছে।